শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মর্যাদা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ সালেহ ফাওযান [অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী]

উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মর্যাদা

مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة

উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মর্যাদা:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمَمِ فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وغيرهم وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ

বরং এই উম্মত যেমন পূর্বের উম্মতসমূহের তুলনায় মধ্যমপন্থী উম্মত হিসাবে পরিগণিত, ঠিক তেমনি এই উম্মতের মধ্যকার বিভিন্ন ফির্কার তুলনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা মধ্যমপন্থী জামাআত হিসাবে গণ্য।

আললাহ তাআলার সুউচ্চ সিফাতের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে সিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং আল্লাহ তাআলার সুমহান সিফাতকে বান্দার সিফাতের সাথে তুলনাকারী মুশাবেবহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে।

আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান হচ্ছে জাবরীয়া এবং কাদারীয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে।

আল্লাহ তাআলার ওয়াঈদ তথা গুনাহর কারণে আল্লাহ তাআলার কিতাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সুন্নাতে শাস্তির যেসব ধমক এসেছে, তাতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান মুরজীয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদিয়ী সম্প্রদায়ের মাঝখানে।

ঈমান এবং দ্বীনের নামগুলোর বিষয়েও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান একদিকে হারুরী (খারেজী) ও মুতাযেলাদের মাঝখানে এবং অন্যদিকে মুরজীয়া ও জাহমীয়াদের মাঝখানে।

এমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ব্যাপারেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান খারেজী এবং রাফেযীদের মাঝখানে।

ব্যাখ্যাঃ শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) কুরআন ও সহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত আল্লাহ তাআলার সুউচ্চ সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান বর্ণনা করার পর উপরোক্ত

বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাদের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। যাতে করে অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য কেবল তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সকল জিনিষের ক্ষেত্রেই একই কথা। সমস্ত বস্তুই তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়।[1]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রঃ) বলেনঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উম্মতের সমস্ত ফির্কার তুলনায় মধ্যমপন্থী ফির্কা হিসাবে স্বীকৃতঃ আলমিসবাহুল মুনীর নামক কিতাবে রয়েছে যে, الوسط শব্দের واو এবং سين বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। ওয়াসাত অর্থ হলো সরল-সোজা। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ন এবং উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

‘‘আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পারো এবং রাসূল হতে পারেন তোমাদের উপর সাক্ষী’’।

সুতরাং আহলে সুন্নাতের লোকেরা ‘ওয়াসাত’। الوسط অর্থ হচ্ছে তারা ন্যায়পরায়ন, উৎকৃষ্ট এবং উত্তম। দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠোরতায় এবং শৈথিল্য প্রদর্শনে যে দু’টি দল বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অবস্থান তাদের উভয়ের মাঝখানে। সেই সাথে যেসব ফির্কা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা তাদের তুলনায় মধ্যমপন্থী।

মুসলিম উম্মত পূর্বের উম্মতদের তুলনায় মধ্যমপন্থী। অতীতের যেসব উম্মত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এই উম্মত তাদের তুলনায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।[2]

অতঃপর শাইখুল ইসলাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মধ্যমপন্থী মাজহাবের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা প্রথমতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সিফাতকে বাতিলকারী জাহমীয়া এবং আল্লাহর সিফাতের উপমা পেশকারী মুশাবেবহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে।

জাহমীয়াদের ইমাম জাহাম বিন সাফওয়ান আত্ তিরমিযীর দিকে নিসবত করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের নাম রাখা হয়েছে। এরা আল্লাহ তাআলার সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ বিশেষণগুলোকেও অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ধারণাপ্রসূত দলীল হচ্ছে আল্লাহর জন্য নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করা হলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা সমস্ত নাম ও সিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে মুআত্তেলা তথা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ সিফাতসমূহকে বাতিলকারী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তাকে অতি সুন্দর নাম ও সুমহান সিফাত থেকে মুক্ত করে ফেলেছে।

আর আল্লাহর সিফাতকে মানুষের সিফাতের সাথে তুলনাকারী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মুশাবেবহা সম্প্রদায় বলার কারণ হলো তারা আল্লাহ তাআলার সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে ফেলেছে এবং আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতগুলোকে মাখলুকের সাধারণ সিফাত সমূহের সাথে তুলনা করেছে।[3] আল্লাহ তাআলা তাদের এ সমস্ত কথার অনেক উর্ধে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাঝখানে। তারা আল্লাহর সিফাতগুলোকে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহর সিফাতকে মাখলুকের সিফাতের সাথে তুলনা করেনা এবং আল্লাহর সুউচ্চ সিফাতগুলোর কোন উপমা ও দৃষ্টান্তও পেশ করেন না। সুতরাং তারা আল্লাহকে মাখলুকের সিফাত থেকে পবিত্র করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন না[4] এবং তাঁর সুউচ্চ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন না। বরং তারা আল্লাহর সিফাতগুলো বাতিল করা ছাড়াই আল্লাহকে সকল ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট থেকে পবিত্র করেন এবং মাখলুকের সাথে তুলনা করা ব্যতীতই তারা আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করেন।

দ্বিতীয়তঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা আল্লাহর কর্মসমূহের ক্ষেত্রেও জাবরীয়া এবং কাদারীয়া সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝখানে। الجبر শব্দের দিকে নিসবত করে তাদের জাবরীয়া সম্প্রদায় হিসাবে নাম রাখা হয়েছে। কেননা তারা বলেঃ إن العبد مجبور على فعله অর্থাৎ বান্দা তার কর্মের উপর একান্ত বাধ্য। তার কোন স্বাধীনতা নেই। সুতরাং তারা আল্লাহর কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার কোন কাজই নেই বলে ধারণা করেছে। তারা আরো মনে করেছে যে, বান্দারা কোন কাজই করেনা। তাদের ধারণায় আল্লাহ তাআলাই একমাত্র কর্তা এবং বান্দার কর্মও আল্লাহ তাআলাই করেন। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে বান্দার সমস্ত নড়াচড়া এবং কর্ম একান্তই বাধ্যতামূলক। বান্দা যেই নড়াচড়া ও কর্ম সম্পাদন করে, তা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কম্পনের মতই। বান্দার কাজগুলো বান্দার দিকে কেবল রূপকার্থেই নিসবত করা হয়।[5]

এবার কাদারীয়া সম্প্রদায়ের কথায় আসি। القدر শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে কাদারীয়া বলা হয়। তারা বান্দাদের জন্য তাদের কর্মসমূহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলেছে, বান্দাই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা। এতে আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং তাদের ধারণায় বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেননি এবং তার ইচ্ছাও করেননি। বরং বান্দারা নিজেদের স্বাধীন ও মুক্ত ইচ্ছাতেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে।[6]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছে, বান্দার জন্য এখতিয়ার ও ইচ্ছা রয়েছে। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই সংঘটিত হয়। তবে সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারেনা। সে কেবল উহাই করে, যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ‘‘আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন’’। (সূরা সাফফাতঃ ৯৬) এখানে বান্দাদের জন্য কর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেই কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তাআলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেনঃ

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ ‘‘তোমরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারোনা’’। এই আয়াতে বান্দাদের জন্য এমন ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার পরে হয়। কাদার তথা তাকদীরের মাসআলা আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা অচিরেই সামনে আসছে ইনশা-আল্লাহ।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর অঈদ বা শাস্তির ভয় দেখানোর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মধ্যমপন্থী। الوعيد অর্থ হচ্ছে আযাবের ভয় দেখানো। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐসব আয়াত ও হাদীছ, যাতে পাপীদের জন্য

আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। শাইখুল ইসলামের উক্তিঃبين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم এর তাৎপর্য হলো আল্লাহর অঈদের (শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের) ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে মুরর্জিয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদীয়া ফির্কার লোকদের অবস্থানের মাঝামাঝি। الإرجاء শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে المرجئة বলা হয়। الإرجاء অর্থ পিছিয়ে দেয়া বা বের করে দেয়া। তারা যেহেতু আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং আমলকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত মনে করেনা, তাই তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। তারা মনে করে কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি ফাসেক নয়। তারা আরো বলে যে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। যেমন কাফের অবস্থায় সৎকাজ করলে সৎকাজ কোন উপকারে আসবে না।[7]

সুতরাং তাদের নিকট কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার।[8] সে শাস্তির সম্মুখীন হবেনা। তারা কবীরাহ গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম লাগাতে গিয়ে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের ধারণায় পাপাচারের কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হয়না এবং কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তির উপর ফাসেক হওয়ার হুকুমও লাগানো যাবেনা।

আর ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মতে গুনাহগারের জন্য শাস্তির যেই ধমক এসেছে, তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ব্যাপারে তারা আরো কড়াকড়ি করে বলেছে যে, সে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।[9] দুনিয়ার হুকুমে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় ফির্কার লোকদের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা বলেন যে, কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তি অপরাধী এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। তার ঈমানেও কমতি আসবে এবং তাকে ফাসেক বলা হবে। মুরজিয়াদের ন্যায় তারা কবীরা গুনাহ্কারীকে পূর্ণ ঈমানদার বলেনা। সে শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ -এ কথাও বলেনা। কিন্তু সে ঈমানের গন্ডি থেকে বের হবেনা এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরকাল থাকবেনা। তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাঁকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে অপরাধের পরিমাণ মোতাবেক তাকে শাস্তি দিবেন।[10] অতঃপর সে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মত এ কথা বলেনা যে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে এবং পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।

সুতরাং মুরজিয়ারা শুধু ঐসব আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে ঈমান আনলেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই) জান্নাতে যাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে। আর ওয়াঈদীয়ারা (খারেজী ও মুতাযেলারা) কেবল ঐসব আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হলে জাহান্নামে যেতে হবে।

কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উভয় প্রকার দলীলকে একত্র করেছেন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন।[11]

চতুর্থতঃ ঈমান ও দ্বীনের বিভিন্ন পরিভাষাতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে কাফের বলা, মুসলিম বলা এবং ফাসেক বলার ক্ষেত্রেও তারা মধ্যমপন্থী। দুনিয়া ও

আখেরাতে গুনাহগারদেরকে কি রকম শাস্তি দেয়া হবে, তাতেও তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হারুরী ও মুতাযেলা এবং মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থানের মাঝখানে। হারুরীরাই খারেজী। হারুরা নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে হারুরী বলা হয়। হারুরা ইরাকের একটি গ্রামের নাম। আলী (রাঃ)এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা হারুরা নামক গ্রামে একত্রিত হয়েছিল। এই জন্যই তাদেরকে হারুরী বলা হয়।

ওয়াসেল বিন আতার অনুসারীদেরকে মুতাযেলা বলা হয়। মুসলিমদের কেউ কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হলে তার হুকুম কী হবে, -এই মাসআলায় তার মাঝে এবং হাসান বসরী (রঃ)এর মাঝে মতভেদ হওয়ার কারণে ওয়াসেল প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করেছিল।[12] পরবর্তীতে ওয়াসেলের অনুসারীরাও হাসান বসরীর দারস ত্যাগ করে ওয়াসেলের সাথে যোগ দেয়। এতে হাসান বসরী বললেনঃ إنه قد اعتزلنا অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের মজলিস পরিত্যাগ করেছে। ইমাম হাসান বসরী (রঃ)এর এই কথা থেকেই তাদেরকে মুতাযেলা বলা হয়।

কবীরা গুনাহয় লিপ্ত মুসলিমের হুকুমের ব্যাপারে খারেজী ও মুতাযেলাদের মাজহাব অত্যন্ত কঠোর। তারা তাকে ইসলামের বাইরে বলে হুকুম লাগিয়েছে। অতঃপর মুতাযেলারা বলেছে, সে মুসলিমও নয়, কাফেরও নয়; বরং সে ঈমান এবং কুফুরী, -এই দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থান করবে।

আর খারেজীরা বলেছে যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তবে উভয় দল পরকালের হুকুমে একমত হয়ে বলেছে যে, কবীরা গুনাহকারী যদি সেই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থান খারেজী ও মুতাযেলাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবীরা গুনাহয় লিপ্ত ব্যক্তির উপর হুকুম লাগাতে গিয়ে তারা চরম শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এবং তার সাথে সহনশীলতা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে। মুরজিয়াদের কথা হচ্ছে لايضر مع الإيمان معصية অর্থাৎ ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচার কোন ক্ষতি করেনা। কেননা তাদের মতে শুধু অন্তরের সত্যায়নকে ঈমান বলা হয়। তবে তাদের কারো মতে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে জবানের উচ্চারণও জরুরী। কিন্তু তাদের কেউ এই কথা বলেনি যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভূক্ত হবে। তাই তাদের মতে আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বাড়েনা এবং পাপাচারের মাধ্যমে উহা কমেনা। সুতরাং পাপাচার ঈমানকে কমিয়ে দেয়না এবং পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তিরও হকদার হয়না। বিশেষ করে যখন পাপাচারকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত না হবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় দলের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তারা বলেছে পাপাচারী পাপাচারে লিপ্ত হলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যায়না। ফলে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর ইচ্ছা করলে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিবেন। কিন্তু শাস্তি দেয়া হলেও চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবেনা। যেমন বলে থাকে খারেজী এবং মুতাযেলারা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা আরো বলে যে, পাপাচার ঈমানের মধ্যে কমতি আনয়ন করে এবং পাপাচারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলে সে কথা ভিন্ন। আর কবীরা গুনাহকারী ফাসেক হয়ে যাবে এবং তার ঈমানও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তারা মুরজিয়াদের ন্যায় কবীরা গুনাহকারীকে কামেল (পূর্ণ) ঈমানদার বলেনা।

পঞ্চমতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযী ও খারেজীদের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়,هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك "যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈমানদার

অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে’’।

রাফেযী নামটি الرفض থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাফয্ অর্থ বর্জন করা, পরিত্যাগ করা। শিয়াদেরকে রাফেযী বলার কারণ হলো, তারা তাদের অন্যতম ইমাম যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইনকে বললঃ আপনি আবু বকর ও উমারের নাম উচ্চারণের পর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলা বর্জন করুন। অর্থাৎ তাদের ফযীলত, প্রশংসা ও সুনাম বলা বর্জন করুন। আলী বিন হুসাইন তখন বললেনঃ معاذ الله অর্থাৎ এরূপ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এতে তারা যায়েদকেই পরিত্যাগ করলো। এ জন্যই তাদেরকে রাফেযী (পরিত্যাগকারী) হিসাবে নাম রাখা হয়েছে।

সাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযীদের মাজহাব হচ্ছে, তারা আলী বিন আবু তালিব এবং আহলে বাইতের ফযীলত বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করে থাকে এবং তাদেরকে অন্যসব সাহাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা বাকীসব সাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। বিশেষ করে তিন খলীফা অর্থাৎ আবু বকর, উমার এবং উছমান (রাঃ)কে তারা শত্রু মনে করে, তাদেরকে গালি দেয় এবং তাদের উপর লা’নত বর্ষণ করে। কখনো কখনো তারা কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত বাকী সবাইকে অথবা কতিপয় সাহাবীকে কাফের বলে।[13]

খারেজীরা শিয়া ও রাফেযীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আলী (রাঃ)কে এবং তাঁর সাথে অনেক সাহাবীকেই কাফের বলেছে,[14] তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ও তাদের জান-মাল হালাল করেছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা রাফেযী এবং খারেজী এই উভয় দলের বিরোধী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা সমস্ত সাহাবীর সাথেই বন্ধুত্ব রাখে। কারো প্রতি ভালবাসা পোষণে বাড়াবাড়ি করেনা; বরং সকল সাহাবীর ফযীলত ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবীদেরকেই এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করে। এ বিষয়ে আরো বিবরণ সামনে আসছে।

ফুটনোট

[1] - অন্ধকারের মাধ্যমেই আলো, মূর্খতার মাধ্যমেই জ্ঞান, অন্যায়ের মাধ্যমেই ন্যায় ইত্যাদিকে ভালভাবে বুঝা যায়। এমনি তাওহীদের বিপরীত শির্ক না বুঝলে তাওহীদের পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করা যায়না এবং বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয়না। এভাবে পৃথিবীতে যেসব বস্তু ও বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা কেবল তখনই অর্জিত হবে, যখন তার বিপরীত বস্তু সম্পর্কেও জানা যাবে।

[2] - পূর্বের উম্মতসমূহের বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি, সীমালংঘন এবং শৈথিল্যের কিছু উদাহরণ হচ্ছে, যেমন (১) ইহুদীরা আল্লাহ তাআলার হকের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে দোষ-ত্রুটি যুক্ত করেছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাকে মাখলুকের কাতারে শামিল করে ফেলেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এই বদ অভ্যাসের প্রতিবাদ করে বলেনঃ

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ

ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

‘‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা লিখে রাখব, অতঃপর বলবঃ ‘আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৮১) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

‘‘আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তাঁর উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন’’। (সূরা মায়িদাঃ ৬৪)

ঐদিকে আবার খৃষ্টানরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে ত্রুটিযুক্ত মাখলুককে পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

‘‘মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রাসূল ও একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, যা আল্লাহ মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ (যে মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো এবং ‘তিন’ বলোনা। এরূপ বলা হতে বিরত হও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট।

কিন্তু এই উম্মত তাদের মত আল্লাহ তাআলার সাথে দোষ-ত্রুটি যুক্ত করেনি এবং কোন সৃষ্টিকেও স্রষ্টার আসনে বসায়নি।

নবীদের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করেছে। ইহুদীরা আল্লাহর নবী ও রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রতি মিথ্যারোপ ও কুফরী করেছে এবং তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাতকে অস্বীকার করেছে। অপর পক্ষে খৃষ্টানরা তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাঁকেই মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী তাঁর ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। এই উম্মত তাঁর ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীতই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং বলেছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এবাদতের বিষয়গুলোতে খৃষ্টানরা চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। পবিত্রতা ছাড়াই তারা আল্লাহর এবাদত

করে। তারা নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করেনা। তাদের কেউ পেশাব করে, সেই পেশাব কাপড়ে লাগে এবং তা নিয়েই গীর্জায় গিয়ে নামায আদায় করে (মন্ত্র পাঠ করে)।

ইহুদীরা এর বিপরীত। তাদের কাপড়ে নাপাকী লাগলে পানি দ্বারা ধৌত করে উহা পবিত্র করেনা; বরং তারা কাপড়ের সেই অংশ কেটে ফেলে দেয়। এমনকি তারা ঋতুবতী মহিলাদের ধারেকাছেও যায়না, তাদের সাথে পানাহারও করেনা।

কিন্তু এই উম্মত হচ্ছে মধ্যমপন্থী। তারা ইহুদীদের মত করেনা এবং খৃষ্টানদের মতও করেনা। তাদের কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে তাসহ নামায পড়েনা এবং কাপড়ের সেই অংশ কেটেও ফেলে দেয়না; বরং তারা কাপড় ধৌত করে নেয় এবং অপবিত্র বস্তু কাপড় থেকে দূর করে দেয়। অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়ে।

এমনি এই উম্মতের কোন পুরুষের স্ত্রীর যখন মাসিক রক্তস্রাব শুরু হয়, তখন তাকে দূরে সরিয়ে দেয়না এবং তার সাথে পানাহার করা থেকে বিরত থাকেনা। বরং একসাথেই পানাহার করে, ঘরসংসার করে এবং সহবাস ব্যতীত সবকিছুই করে।

খাদ্য ও পানীয় বস্তুসমূহ থেকে হালাল ও হারামের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করেছে। খৃষ্টানদের মধ্যে হারাম বলতে কিছু নেই। তারা শুকরসহ সকল শ্রেণীর নাপাক ও হারাম বস্তুকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে। ঐদিকে ইহুদীরা নিজেদের উপর কড়াকড়ি করে বেশ কিছু হালাল জিনিষকে হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

‘‘আর আমি ইহুদীদের জন্য নখ ওয়ালা প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাদের পিঠে, কিংবা নাড়ীভূঁড়ি বা হাড়ের সাথে যা লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম। আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য’’। (সূরা আনআমঃ ১৪৬) আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা না মানার কারণেই শাস্তি স্বরূপ এমনটি করা হয়েছিল।

কিন্তু এই উম্মত হচ্ছে এ বিষয়েও মধ্যমপন্থী। তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো হালাল করা হয়েছে এবং অপবিত্র জিনিষগুলো হারাম করা হয়েছে।

কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার বিষয়ে এই উম্মতের জন্য মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহুদীদের উপর কিসাস গ্রহণ করা ফরয ছিল। খুনীকে মাফ করে দেয়া নাসারাদের উপর আবশ্যক ছিল। কিন্তু এই উম্মতের জন্য রয়েছে মধ্যম পন্থা। তাদেরকে কিসাস নেয়া, কিংবা কিসাসের বদলে দিয়াত গ্রহণ করা কিংবা কোনটিই না নিয়ে মাফ করে দেয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং অন্যান্য উম্মতের তুলনায় উম্মতে ইসলামীয়ার জন্য মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করার সুযোগ রাখা হয়নি। বরং সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যকার সকল ফির্কার তুলনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা মধ্যমপন্থী। যেমন উম্মতে ইসলামীয়া অন্যসব উম্মতের তুলনায় মধ্যমপন্থী।

[3] - এরা আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাদের কথা হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু নিজের সত্তার জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তা সাব্যস্ত করা। তারা আল্লাহর শানে এত বেআদবী প্রদর্শন করে বলেছে যে, আল্লাহর সিফাত বলতে আমরা মাখলুকের সিফাতকেই বুঝে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতগুলো মাখলুকের সিফাতের মতই। আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতই। এমনি চোখ, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ) এই গোমরাহ লোকেরা আরো বলেছে আল্লাহ যেহেতু নিজের জন্য মুখমণ্ডল সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমরা তা সাব্যস্ত করবো এবং বলবো যে, আল্লাহর চেহারা বনী আদমের একজন সুদর্শন যুবকের চেহারার মতই। (নাউযুবিল্লাহ)

[4] - বরং তারা কেবল আল্লাহর পবিত্র সত্তা থেকে উহাই অগ্রাহ্য করে, যা কেবল আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নিজের সত্তা থেকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল তাঁর সুন্নাতে তাঁর প্রভু থেকে অগ্রাহ্য করেছেন।

[5] - এই শ্রেণীর গোমরাহ লোকেরা আল্লাহর সাথে বেআদবী প্রদর্শন করে আরো বলেছে যে, বান্দা গোসল দাতার হাতে মৃত ব্যক্তির মতই এবং শিশুর হাতে কাঠের পুতুলের মতই। বান্দা ভাল-মন্দ যা করে, তা মূলত আল্লাহ করেন। বান্দার কাজে ও কর্মে বান্দা মোটেও স্বাধীন নয়। তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। সৃষ্টির উপর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করতে গিয়েই তারা এতটা বাড়াবাড়ি করেছে।

আল্লাহ তাআলার কর্মের ব্যাপারে জাবরীয়াদের উপরোক্ত মাজহাব সঠিক নয়। কারণ বান্দার কাজে যদি তার স্বাধীনতা নাই থাকতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো কাজ করা বা না করার আদেশ দিতেন না। আল্লাহ তাআলা যেহেতু তাকে বলেছেন, এটা করো, ওটা করোনা, তাতে বুঝা গেল, কাজ করার বা না করার ক্ষেত্রে বান্দা স্বাধীন এবং কাজ করার ক্ষমতাও তার রয়েছে। সুতরাং বান্দার কাজ বান্দাই করে, আল্লাহ নয়, বান্দার নামায বান্দাই পড়ে, আল্লাহ নয়, এমনি বান্দার পাপকর্ম........। মূলতঃ জাবরীয়াদের এই বাতিল মাজহাব থেকেই মুসলিমদের আকীদায় সর্বেশ্বরবাদ তথা সবকিছুতেই স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বান্দার কর্মে বান্দা যে স্বাধীন, তা আমাদের প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে অনুভব করে থাকে। বিবেক ও যুক্তি এটিকে সমর্থন করে। এটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই হয় বলে আল্লাহ তাআলা তার কাজের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। অন্যথায় শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান নিরর্থক হয়ে যায়।

পৃথিবীর কোন আদালতে যখন কোন অপরাধীকে হাযির করা হয়, তখন বিচারকের সামনে গিয়ে অপরাধী যদি বলে আমি এই অপরাধ করি নাই; আল্লাহ করেছেন, কোন আদালত তার এই কথাকে সমর্থন করবেনা এবং তাকে শাস্তি থেকেও রেহাই দিবেনা। মানুষের কাজ মানুষ করে বলেই শাস্তি তাকেই দেয়া হয়। ভাল কাজ করলে

পুরস্কারও সে পায়; আল্লাহ নয়। তবে সকল কাজের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, বান্দা কোন কিছুরই স্রষ্টা নয়। এ বিষয়টি আমরা শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়াতে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাই পাঠকদেরকে গুরুত্বসহ সেই কিতাবটিও পড়ার অনুরোধ করছি।

[6] - কাদারীয়াদের এই মত সঠিক নয়। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি ও কর্মে অন্যকে শরীক করে ফেলেছে। এই জন্যই তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক হিসাবে নাম করণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; তারা আরো দাপট দেখিয়ে বলেছে যে, বান্দার কাজ শেষ হওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে জানেনও না। নাউযুবিল্লাহ।

[7] - তবে কাফের যদি ঈমান গ্রহণ করে, তাহলে কুফরীর হালতে যেসব ভাল কাজ করেছে, তা দ্বারাও সেই উপকৃত হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

[8] - মানুষকে মুমিন বানানোর ক্ষেত্রে তাদের এই কথা চরম বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের প্রমাণ করেছে। তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চুরি, ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যাসহ যত অপরাধই করুক না কেন, ঈমানের কোন ক্ষতি হবেনা। তাদের কথা থেকে আরো আবশ্যক হয় যে, যারা ঈমান আনয়ন করার পর ফরয বা সুন্নাত কোন আমলই করেনা আর যারা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ নামায আদায়সহ যাবতীয় সৎকাজে প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

[9] - তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

‘‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন তার উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি। (সূরা নিসাঃ ৯৩) খারেজী, মুতাযেলা এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই আয়াত এবং যেসব আয়াতে পাপীদেরকে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেছে যে, এই ধমক বাস্তবায়ন করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। সুতরাং তাদের মতে কবীরা গুনাহকারীরা কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল থাকবে।

[10] - আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন’’। (সূরা নিসাঃ ৪৮) এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে শির্ক ব্যতীত অন্যসব গুনাহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে কিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে ইনসাফ স্বরূপ তাকে গুনাহর

পরিমাণ শাস্তি দিবেন। আর দুনিয়ার হুকুমে সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায়না।

[11] - আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের লোকেরা শরীয়তের কোন একটি দলীলের দিকে ঝুকে পড়ে অন্যান্য দলীলকে বর্জন করেনা। তারা সমস্ত দলীলের উপরই আমল করে। তাই তারা উক্ত মাসআলাতেও উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় করে মধ্যমপন্থা এভাবে অবলম্বন করেছেন যে, কুরআন এবং হাদীছের পরিভাষায় অনেক আমলকে কুফরী বলা হয়েছে এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে আবার এমন অনেক দলীলও রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, যেকোন কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়না। যতক্ষণ না গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। গুনাহ করলেই যেহেতু কোন মুসলিম কাফের হয়ে যায়না, তাই তাওবা না করে মারা গেলে তাতে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামও আবশ্যক হয়না। একাধিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম কাফের হয়ে যায়না। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজকরণ এবং অনুগ্রহ বিশেষ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব”। (সূরা বাকারাঃ ১৭৮) সুতরাং এখানে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীকে মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন এবং তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ভাই হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ভাই। আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

“মুমিনদের দুই দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফ কারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও”। (সূরা হুজরাতঃ ৯-১০) এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যার কিছু আমরা শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়াতে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা প্রমাণ করে যে, (অবিবাহিত) ব্যভিচারী, চোর এবং ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীকে হত্যা করা হবেনা। বরং তাদের প্রত্যেকের উপর নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, অনুরূপ গুনাহএ লিপ্ত কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়না।

[12] - এই ঘটনা সম্পর্কে আরো যা জানা যায়, তা হচ্ছে একদা হাসান বসরী (রঃ)এর মজলিস চলছিল। সেখানে একজন শিষ্য প্রশ্ন করল যে, কোন মুসলিম যদি কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হয়, তার হুকুম কী হবে? জবাবে হাসান বসরী (রঃ) বললেন, সে মুমিনে ফাসেক তথা ফাসেক মুমিন হিসাবে গণ্য হবে। সেই মজলিসে হাসান বসরীর অন্যতম মেধাবী ছাত্র ওয়াসেল বিন আতাও ছিল। ওয়াসেল উস্তাদের সাথে উক্ত মাসআলায় খেলাফ (ভিন্ন মত পোষণ) করতে লাগলো। সে বলতে লাগলো, কবীরা গুনাহকারী মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করবেনা; বরং সে ঈমান ও কুফরীর মাঝে ঝুলতে থাকবে। আর সে যদি বিনা তাওবায় মারা যায়, তাহলে পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং চিরকালই সেথায় থাকবে। কখনো বের হবেনা। এটি ছিল একটি বিদআতী কথা, যার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ ইসলামে এই বিশেষণের কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

ঐদিকে হাসান বসরীও বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ওয়াসেলকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওয়াসেল কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হলোনা। পরিশেষে স্বীয় উস্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মজলিস ত্যাগ করলো এবং মসজিদের অন্য প্রান্তে গিয়ে আলাদা মজলিস তৈরী করল। এতে করে তারও কিছু ভক্ত ও অনুসারী তৈরী হলো।

হাসান বসরী (রঃ) ওয়াসেলের এই কান্ড দেখে বললেন যে, اعتزل عنا واصل অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাজহাব পরিত্যাগ করেছে। তাঁর এই কথার কারণেই ওয়াসেল এবং তার অনুসারীদেরকে মুতাযেলা বলা হয়। একটি মাসআলাকে কেন্দ্র করে মুতাযেলা মাজহাবের যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে আরো কিছু মূলনীতি তাতে প্রবেশ করে। এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং শরহুল আকীদা আত্ তাহাবীয়ায় আমরা মুতাযেলা এবং অন্যান্য বিদআতী ফির্কার বিভিন্ন মূলনীতি উল্লেখ করেছি। তাই পাঠকদের প্রতি শরহুল আকীদাহ আত্ তাহাবীয়া গুরুত্বের সাথে পাঠ করার অনুরোধ রইলো।

[13] - উপরে যা বলা হয়েছে, সাহাবীদের ব্যাপারে তাদের কথাগুলো তার চেয়েও আরো অধিক জঘণ্য। কুরআন ও হাদীছের যেখানেই লা'নতের কথা এসেছে, তা পড়া ও শ্রবণ করার সময় তারা মনে করে যে, এর দ্বারা আবু বকর, উমার (রাঃ) উদ্দেশ্য। তারা আরো বলে যে, সাহাবীগণ কুরআনের অনেক আয়াত গোপন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) শুধু তাই নয়; উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)এর চারিত্রিক পবিত্রতার ব্যাপারে তারা মারাত্মক জঘন্য কথা বলেছে। তাদের এ রকম আরো অনেক খারাপ ও বাতিল আকীদাহ রয়েছে, যার কারণে আলেমগণ তারা উম্মতে ইসলামীয়ার বাইরে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তারা আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে। তারা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আলীই ছিলেন খেলাফাতের বৈধ হকদার। কিন্তু আবু বকর ও উমার (রাঃ) জোর করে খেলাফত দখল করে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের কিছু কিছু গ্রুপ আলীকেই আল্লাহ মনে করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা ইয়া হুসাইন ইয়া

হুসাইন বলে যেসব কথা বলে, তা সুস্পষ্ট শির্ক। শিয়া ও রাফেযীদের সম্পর্কে কারবালার ঘটনা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা পড়ার অনুরোধ রইল। সেখানে তাদের বেশ কিছু অপকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

[14] - তারা আলী এবং মুআবীয়া উভয়কেই কাফের বলেছে। এ ব্যাপারে খারেজীদের দলীল হচ্ছে আলী এবং মুআবীয়া (রাঃ) আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে মানুষকে বিচারক নির্ধারণ করেছেন, যা কুফরী। আহলে সুন্নাতের কথা হচ্ছে খারেজীদের এই ধারণা মূর্খতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহর কুরআন যেহেতু মানুষের সাথে কথা বলেনা, কোন না কোন মানুষের মুখ থেকেই তা বের হবে, তাই মানুষকে বিচারক বানানো কুফরী নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ন্যায়পরায়ন মানুষকে ফয়সালাকারী ও বিচারক বানাতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকার করোনা। আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নয্রানা দিতে হবে, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি”। (সূরা মায়িদাঃ ৯৫) সুতরাং বিচারক মানুষই হবে। আল্লাহর কথা মানুষের জবান থেকেই বের হবে।

যেসব সাহাবী খারেজীদের বুঝিয়ে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)এর প্রচেষ্টায় অনেকেই খারেজীদের দল ত্যাগ করে ফিরে আসে। অনেকেই আবার খারেজীদের সাথেই থেকে যায়। যারা ফিরে আসেনি, আলী (রাঃ) নাহরাওয়ান্দের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত ও হত্যা করেছেন।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8521

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন